ANTARVIDYA
ISSN: 3107-7447
https://www.debracollege.ac.in/antarvidya/Index.aspx

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.010.2026

দৈনন্দিন জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের ভক্তিযোগের প্রাসঙ্গিকতা

সুকান্ত সরকার
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ
philosukanta84@gmail.com

Submitted on: 14/11/2025
Accepted on: 28/06/2026

সারাংশঃ
স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার এক মহান পুরুষ, যাঁর জীবন এবং শিক্ষা সবসময়ই আমাদের প্রেরণার উৎস। তাঁর দর্শন এবং আদর্শে ভক্তিযোগের একটি গভীর স্থান রয়েছে, যা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বাস্তব জীবনের নানা দিকেও এর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। ভক্তিযোগ মানুষের আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা অর্জন, দৈনন্দিন জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করার পথ প্রদর্শক। তাঁর মতে, ভক্তি কোনও বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি অন্তর্দৃষ্টি, একটি গভীর অন্তর্মুখী অনুভূতি, যা আমাদের আত্মা এবং ঈশ্বরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। তিনি বলেন, "ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা আসবে না, যতক্ষণ না আমরা আমাদের হৃদয়কে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করি।" এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ভক্তিযোগ শুধু মনের শান্তি এবং আত্মবিশ্লেষণের জন্য নয়, বরং ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। এর মাধ্যমে একজন ভক্ত তাঁর অন্তরকে বিশুদ্ধ করে, এবং সর্বোপরি ঈশ্বরের প্রেমে একাত্ম হয়ে ওঠে।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ভক্তিযোগ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এটির বিশাল প্রভাব রয়েছে। ভক্তিযোগের শিক্ষা মানুষের মধ্যে নৈতিকতা, সদাচারিতা, দায়িত্বশীলতা, একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা এবং কর্মের প্রতি ভক্তিভাব জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। এই ভক্তিভরা একাগ্র মনই পারে জীবকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে। বিবেকানন্দের মতে, সত্যিকারের ভক্তি একজন মানুষকে সমাজসেবা এবং মানবকল্যাণে নিযুক্ত রাখতে সাহায্য করবে। তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি শুধুমাত্র মন্দিরে নয়, প্রতিটি মানুষের মধ্যে, প্রতিটি মানুষের জন্য এবং প্রতিটি কাজের জন্য ভক্তি থাকা উচিত, তবেই তিনি আসল ভক্ত হবেন। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করেন যে, এই ভক্তিই মানুষকে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সহায়ক হতে পারে। এই প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ভক্তিযোগের আধ্যাত্মিক মহিমা দৈনন্দিন জীবনে বা ব্যবহারিক জীবনে কতটা গুরুত্ববাহী এবং তা আজকের পৃথিবীতে মানব জীবনে কতটা প্রাসঙ্গিক, তারই অনুসন্ধান এই গ্রন্থে করা হবে।

সূচক শব্দঃ ভক্তিযোগ, ভক্তি, সংযম, একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা, মুক্তি, আত্মস্বরূপ, ঈশ্বরস্বরূপ, ইষ্টসাধনা, আধ্যাত্মিকতা, ব্যবহারিক জীবন/দৈনন্দিন জীবন

সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, সমস্ত রকম জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, আমাদের স্বরূপ বোঝার জন্য, নিজেকে জানার জন্য, বিভিন্ন শাস্ত্রে, বিভিন্ন মনীষীগণ নানাবিধ পথ বা উপায়ের কথা বলেছেন। তার মধ্যে অন্যতম

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.010.2026

একটি পথ হল ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগের মূল কথা হল– ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করা। অর্থাৎ ভগবানের প্রতি পরম অনুরক্তিকেই বা পরম প্রেমকেই ভক্তি বলা হয়। ভগবানের প্রতি এই পরম প্রেম থেকে একদিন মুক্তি আসবে। ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেম, ভক্তি একদিন সব জীবে ঘৃণাশূন্য করে তুলবে, সবকিছুর প্রতি প্রেমবান করে তুলবে। এই ঈশ্বর ভক্তি মনের মলিনতা দূর করে দেবে। রাগ, দ্বেষ, কামনা বাসনা সরিয়ে দেবে, এবং মনের মধ্যে প্রেমের উদয় হবে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমময় এই অবস্থা একদিন বিষয়ের প্রতি বাসনা ত্যাগ করিয়ে দেবে। সমস্ত রকম কামনা বাসনার উর্ধ্বে উঠে গিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টায় মন ব্যাকুল হয়ে যাবে। তখন আমাদের চারিপাশের সমস্ত কিছুর প্রতি আসক্তি দূর হয়ে যাবে। একমাত্র প্রেমময় ঈশ্বরের কথাই মনে ভাসবে। এই ঈশ্বর প্রেমকেই ভক্তি বলা হয়।

আমরা ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো যে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি যোগ আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা হলেও এই সব যোগের মূল লক্ষ্য একই। সমস্ত যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো মুক্তি। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবার পথ মাত্র। তথাপি শাস্ত্রকারদের মতে, ভক্তিযোগ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবার সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা।[১] তাই হয়ত স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “ভক্তিযোগে এক বিশেষ সুবিধা- এটি আমাদের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরে পৌঁছাবার সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা।” স্বামী বিবেকানন্দের মতে, যোগের এই পথ ধরে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যেমন খুব সহজ, তেমনি আবার ঝুঁকিও অনেক বেশি। কেননা নিম্নস্তরের ভক্তি অনেক ভয়ানক গোঁড়ামির আকার ধারণ করে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখা যায় যে, একে অপরের ধর্মের উপর তীব্র আক্রমণ করে এবং দোষারোপ করে। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ আদর্শ ভাব অনুসারেই ধর্ম পালন করতে বলে এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের আদর্শকে মিথ্যা বলে দোষারোপ করে। তাঁরা নিজ নিজ আদর্শ অনুসারে ভালোবাসার কথা বলে এবং অপর আদর্শকে ঘৃণা করে। এই সমস্ত লোকেরা নিজ ধর্মের আদর্শ ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাদর্শের কথা শুনলে কলহে মত্ত হয়ে যায় এবং সর্বদা নিজ ধর্মের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের চেষ্টায় মত্ত হয়ে যায়। তাঁরা কখনো বিচার করে দেখার চেষ্টা করে না যে, অন্য ধর্ম যে মত বা আদর্শের কথা বলে তা সত্য কিনা মিথ্যা। তারা ভুলে যায় প্রকৃত জ্ঞান আসে পূর্ণ ভক্তি থেকে; কামনা বাসনা হীন প্রেম ভক্তি থেকে প্রকৃত জ্ঞান পাওয়া যায় এবং প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হলে তখন বিভেদ থাকে না, সত্যকে জানতে পারে। তাই বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রকৃত ভক্তি ও প্রকৃত জ্ঞান অভিন্ন।[২]

ভক্তির স্বরূপ কি হবে? সেটা বলতে গিয়ে দেখা যায় অনেক শাস্ত্র ও শাস্ত্রকার বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তথাপি আমরা দেখতে পাই যে, ভক্তি বলতে সমস্ত রকম জাগতিক, ইন্দ্রিয়গত কামনা-বাসনা ত্যাগ করে ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম-ভালোবাসাকেই বোঝানো হয়। আমাদের সমস্ত আসক্তি, সমস্ত আগ্রহ যদি ঈশ্বরকে জানার জন্য হয়, অন্য কোনো কিছুর প্রতি যদি কোনো আসক্তি বা আগ্রহ না থাকে, অর্থাৎ জগতের সমস্ত সুখ-দুঃখ ভুলে গিয়ে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমকেই ভক্তি বলা হয়েছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, আমাদের সমস্ত রকমের পূজা-পাঠ থেকে শুরু করে ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত অনুরাগ, এমনকি সমস্ত রকম আধ্যাত্মিক অনুভূতির চেষ্টাকেই ভক্তি বলা হয়। যে ব্যক্তি সমস্ত প্রিয় এবং অপ্রিয় বস্তু থেকে আসক্তি সরিয়ে এনে একমাত্র ভগবানে বা লক্ষ্যবস্তুতে সমস্ত আসক্তি প্রয়োগ করতে পারেন, তিনিই ভক্তি করেছেন। সমস্ত বিষয় ত্যাগ করে কেবল ঈশ্বরকে জানার চেষ্টাকেই ভক্তি বলা হয়। যে ব্যক্তি মনে করেন ঈশ্বরই আত্মস্বরূপ, তাই সমস্ত বিষয় প্রসঙ্গ ত্যাগ করে আত্মাকেই জানতে হবে, তিনিই প্রকৃত ভক্ত।[৩] গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দ্বেষশূন্য, বন্ধু ভাবাপন্ন, কৃপালু, মমত্ববুদ্ধি শূন্য, সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সর্বদা ভক্তিযোগে যুক্ত, সংযম স্বভাব, দৃঢ় সংকল্পযুক্ত, এবং যার মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। যার থেকে কেউ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, যিনি কারও দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না এবং হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনি

আমার অত্যন্ত প্রিয়। যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, উদ্বেগশূন্য এবং সমস্ত কর্মের ফলত্যাগী, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। যিনি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে খুশি হন না, অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে রাগ করেন না, যিনি প্রিয় বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রিয় বিয়োগে খুশী হন না। যিনি শুভ ও অশুভ সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করেছেন, যিনি শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমবুদ্ধি, যিনি সম্মানে ও অপমানে, শীতে ও গরমে, সুখে ও দুঃখে এবং নিন্দা ও স্তুতিতে সমভাবাপন্ন, যিনি কুসঙ্গ বর্জিত, সংযত বাক্, যৎকিঞ্চিত লাভে সন্তুষ্ট, যিনি আসক্তি শূন্য এবং যিনি স্থিরবুদ্ধি ও আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত; তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত।[৪] এইভাবে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়; অনুরাগ বৃদ্ধির ফলে ভক্তের অন্তরে ঈশ্বরের বিষয়ে একটি আন্তরিক টান দেখা দেয়। অর্থাৎ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বা ভগবানকে পাওয়ার জন্য ভক্তের মনে ঐকান্তিক আগ্রহ তৈরি হয়; ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের এইরকম টানকেই ভক্তি বলা হয়। এই টান বা ভক্তি যার মধ্যে আছে, তিনি প্রকৃত ভক্ত বলে কথিত।

যে ভক্তির কথা আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছিলাম, সেই ভক্তির স্বরূপ কেমন হবে? ভক্তের ভক্তির ধরন কেমন হবে? সেই কথা বলতে গিয়েই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ভক্ত ঈশ্বরের কোন কোন রূপের উপাসনা করবে, কারণ সগুণ ও সাকার ঈশ্বর এবং নির্গুণ ও নিরাকার ঈশ্বর আলাদা দুটি ঈশ্বর নন। তিনি একদিকে নির্গুণ ও নিরাকার, অন্যদিকে সগুণ ও সাকার। তবে নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপের উপাসনা করা যায় না। কারণ নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপের উপাসনা করতে গেলে নির্গুণ ব্রহ্ম আর নির্গুণ থাকে না, কারণ নির্গুণ ব্রহ্মের উপর কোনো বিশেষণ আরোপ করা যায় না; কেননা বিশেষণ আরোপ করলে তিনি আর নির্গুণ থাকেন না। তাই নেতি নেতি করে জ্ঞানযোগীর বিচারমূলক জ্ঞানযোগ গম্য হয়। এই জন্য ভক্তগণ ব্রহ্মের সগুণ ভাব অর্থাৎ স্রষ্টা, পালক, সংহারক ঈশ্বরেরই উপাসনা করে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, এই উপাসনা করতে করতে যারা এমন এক অবস্থায় পৌঁছান, যে অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ভোক্তা, ভুক্ত এবং সৃষ্টি, স্রষ্টা কোনো রকম ভেদ থাকে না। যে অবস্থাকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, যে অবস্থাকে কোনো বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না, যে অবস্থাকে "এটা অমুক নয়, এটা তমুক নয়" অর্থাৎ যে অবস্থাকে "নয়" "নয়" করে বর্ণনা করতে হয়। কিন্তু যারা এই রকম অবস্থা লাভ করতে পারে না, তাঁদের কাছে এই ব্রহ্মই প্রকৃতি, আত্মা এবং অন্তর্যামী। অর্থাৎ তাদের কাছে ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম হিসাবে পরিচিত।[৫] আসলে ব্রহ্ম সগুণ, সাকার নয়? ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিশেষ এক এবং অদ্বিতীয়। যখন সাধক বা ভোক্তা সাধনার শীর্ষে পৌঁছায় অর্থাৎ সাধকের সাধনা বা ভক্তি বা গৌণী যখন পরাভক্তিতে পরিণত হয়, তখন তার মনে এই সগুণ-নির্গুণ ভেদ থাকে না। সৃষ্টি-স্রষ্টা ভেদ থাকে না, তখন এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝতে পারে এবং মুক্তি লাভ করে।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ভক্ত যখন শুরুর দিকে এই সাধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের এই স্বরূপ জানার চেষ্টা করে, তখন সাধকের মনে যে যুক্তির অস্পষ্টতা এবং চিত্তচাঞ্চলতা থাকে, তা আর থাকে না। তিনি শ্রীঘ্রই ঈশ্বরের কৃপায় এমন এক অবস্থা লাভ করেন যখন তার মনে কোনো যুক্তি, বিচার, বিশ্বাস বা অন্ধবিশ্বাস কিছুই থাকে না। তখন তিনি ভগবানকে উপলব্ধি করেন। কিন্তু যারা ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তাদের পক্ষে এই উচ্চতর সাধন ক্রিয়া সম্ভব নয়। এই উচ্চতর সাধন কার্য, অর্থাৎ ভক্তিমার্গের এই স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য বিভিন্ন শাস্ত্র বা ধর্ম নির্দেশিত পথের সাহায্য নিতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেন – ঈশ্বরের নির্গুণ ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করতে হয়। তা না হলে ঈশ্বরের নির্গুণ ভাব মানবীয় ভাষায় সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তাই ভক্তি শাস্ত্র মতে বলা যায়, ভগবানের উপাসনা করতে হলে সাধারণ উপাসকের পক্ষে কোনো না কোনো মূর্তিকে সামনে রেখে উপাসনা করা আবশ্যক। এখানে মূর্তি বলতে অবয়ব বিশিষ্ট যে বস্তু ঈশ্বর রূপে উপাসনা যোগ্য, তাকেই বুঝতে হবে। এই মূর্তি উপাসনার সাহায্যে ব্রহ্মের অনুসন্ধানই মূর্তি উপাসনার লক্ষ্য। হিন্দুশাস্ত্রে যে বিভিন্ন মূর্তি উপাসনার কথা বলা হয়েছে, তার মূল কারণ হল, এই উপাসনার সাহায্যে ঈশ্বরের

নিকটে পৌঁছানোর একটি পথ বা উপায়। এই মূর্তি উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরের সন্নিকটে আসার শক্তি লাভ হয়। কেবল ঈশ্বরই ভক্তের উপাস্য এবং উপাসনাই ভক্তির মুক্তি লাভের মাধ্যম। যেখানে এই মূর্তি বা প্রতিমা কোনো দেব-দেবী বা মহাত্মা ঈশ্বররূপে বা ব্রহ্মরূপে দেখা যায়, সেখানে সেই উপাসনা ঈশ্বরের উপাসনার সমান ফল প্রদান করে। এই উপাসনার মাধ্যমে ভক্তি ও মুক্তি উভয়ই লাভ হয়। উপাসক মূর্তির সাহায্যে ঈশ্বর উপাসনায় অগ্রসর হতে হতে একসময় তার ভক্তি রাগানুরাগে পরিণত হয়। তখন তাঁর পক্ষে আর মূর্তি পূজা বা উপাসনা করা সম্ভব হয় না; তখন তিনি নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনায় হারিয়ে যান এবং ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেন, ফলে মুক্তিলাভ করেন। এটি ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

ভক্তিযোগ আমাদের শিক্ষা দেয় ভক্তি কী। ভক্তিযোগে যে ভক্তির কথা বলা হয়েছে, সেটা ভক্তি কিরূপে বা কোন উপায়ে করলে সাধারণ মানুষ ঈশ্বর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে এবং ঈশ্বর স্বরূপ দর্শন করতে পারবে। ভক্তিযোগ শাস্ত্র মতে, সাধারণ মানুষ যারা জ্ঞানী–গুণী ব্যক্তি নন, তাঁরা কীভাবে নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বর স্বরূপ দর্শন করতে পারবে। ভক্তিযোগ শাস্ত্রমতে, এমন হিন্দুধর্মশাস্ত্র অনুসারেও ভগবানের সরাসরি স্বরূপ দেখবার বা বোঝবার মতো সাধ্য সাধারণ মানুষের থাকে না। সাধারণ মানুষের পক্ষে নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরের যথার্থ ধারণা করা সাধ্যাতীত। কেবল পরমজ্ঞানীগণই ঈশ্বরের এই নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ ভাবের ধারণা এবং ধ্যান সাধনা করতে পারেন। সাধারণ মানুষ সগুণ ও সাকারের ঈশ্বরকে মূলত মানুষ আকারের উপাসনা করে। নরদেহধারী অবতারকে বিভিন্ন কালে ভক্তগণ সগুণ ও সাকার ঈশ্বররূপেই পূজা উপাসনা করেন। বিভিন্ন সময় এই নরদেবগণ মানুষরূপে আবির্ভূত হয়ে দেখান ভগবান কেমন এবং তাঁকে কীভাবে লাভ করা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, "সাধুদিগণের পরিত্রাণ, দুষ্টের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"[৬]

স্বামীজী মনে করেন প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তিকে জাগ্রত করতে মানুষের মধ্যে আপাতভাবে অব্যক্ত ভাবগুলিকে জাগিয়ে তুলতে হলে, আধ্যাত্মিক জীবনকে সতেজ করতে হলে ও তার উন্নতি ও ত্বরান্বিত করতে হলে অপেক্ষাকৃত অধিকতর আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মানুষের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ এই সহায়তার ফলেই সাধারণ মানুষের স্বভাব শুদ্ধ ও সিদ্ধ হতে পারে। বিবেকানন্দের মতে, এই আধ্যাত্মিক শক্তি গ্রন্থ পাঠ বা পুস্তক পাঠ থেকে হয় না; এগুলি থেকে কিছু বুদ্ধির বিকাশ ঘটলেও আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় না। এই আধ্যাত্মিক উন্নতি কেবলমাত্র অপর এক জীবাত্মা থেকেই হতে পারে। সেই কারণেই আমাদের গুরুর সান্নিধ্যের প্রয়োজন হয়। যে ব্যক্তির আত্মা থেকে অপর ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাকে গুরু বলে। আর যে ব্যক্তির আত্মাতে শক্তি সঞ্চিত হয়, তাকে শিষ্য বলে। এই রকম শক্তি সঞ্চারিত ও সঞ্চয় করতে হলে সেই অনুরূপ শক্তি থাকা আবশ্যক; তবেই প্রকৃত ধর্মের বা আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে চান, সেই ব্যক্তির গুরুর সাহায্য নিতে হবে। গুরুর পূজা করতে হবে, গুরুর ভক্তি করতে হবে। তাই বলা হয় গুরুভক্তি ভক্তিসাধনার একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ।[৭]

গুরু নির্বাচন ভক্তি সাধনার একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ। যে গুরু হবেন, তাকে চিনব কীভাবে? স্বামী বিবেকানন্দ বলেন– সূর্যকে প্রকাশ করার জন্য যেমন কোনো মশাল প্রয়োজন হয় না, তার নিজের স্বভাবই তাকে প্রকাশিত করে। তেমনি আমাদের সাহায্য করার জন্য যে গুরু আসবেন, যে আচার্যের হৃদয়ে জ্ঞান সত্য সূর্যালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়, তাদের চিনবার প্রয়োজন হয় না। তারা স্বতই প্রকাশিত হন। কিন্তু আমাদের মতে, অল্পজ্ঞ মানুষের পক্ষে তাদের চেনা কঠিন। তাই তিনি মনে করেন, গুরু ও শিষ্যের বিশেষ লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন, যাতে করে অল্পজ্ঞ মানুষ একজন আচার্যকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারে। উপনিষদে বলা হয়েছে – "ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করবে।"[৮] স্বামী বিবেকানন্দের মতে, গুরুকে শাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানী হতে হবে। গুরু হলে তাকে শাস্ত্রের মর্মকথা

জানতে হবে। গুরুকে নিষ্পাপ হতে হবে।[৯] কেননা একজন গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতে হবে। আর সেই ব্যক্তির যদি চিত্ত ও মন শুদ্ধ না থাকে, তাহলে তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতে পারবেন না। গুরুর নিজের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চিত না থাকলে তিনি শিষ্যদের আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করতে পারবেন না। আর এই শক্তি সঞ্চিত করতে হলে তাকে কায় ও মনে পবিত্র ও নিষ্পাপ হতে হবে। উপনিষদে বলা হয়েছে, 'অনভিজ্ঞ গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হলে আত্মাকে সম্যক্ রূপে জানা যায় না।'[১০] সাধারণত দেখা যায়, অন্যান্য বিদ্যার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান শিক্ষা লাভ করলেই শিক্ষা লাভ হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয় শিক্ষা লাভ করার জন্য শুধুমাত্র অভিজ্ঞ গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করলেই হয় না; সেক্ষেত্রে গুরুর মানসিক দিকটাও লক্ষ্য করতে হয়। যে গুরুর নাম, যশ ও খ্যাতির চিন্তা থাকে, সে কখনোই আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেন, আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাকে সমস্ত রকম কামনা-বাসনাহীন হতে হবে এবং বিদ্বান হতে হবে। যিনি শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হবেন, যার কাজের নিয়ামক সমগ্র মানবজাতির প্রতি শুদ্ধ প্রেম। কেননা আধ্যাত্মিক শক্তি শুদ্ধ প্রেমের মাধ্যমেই সঞ্চারিত হতে পারে। কোনো স্বার্থপর ব্যক্তি, পূর্ণ ব্যক্তি বা লোভী ব্যক্তি ভগবদ্ শিক্ষা দিতে পারে না। যিনি ভগবানকে প্রেমস্বরূপ বলে জানেন, তিনিই কেবল আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতে পারেন। এই গুরু খুঁজে পেলেই ধর্ম খুঁজে পাওয়া যাবে। এই গুরুর সেবা করতে হবে, তাকে বিশ্বাস করতে হবে, তার কাছে প্রাণ খুলে দিতে হবে। যারা গুরুর প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধাবান হয়ে সত্যানুসন্ধান করে, তাদের কাছে কোনটা সত্য এবং কোনটা মিথ্যা আপনা আপনিই প্রকাশিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব তাই বলেন, "গুরুর কৃপা হলে আর ভয় নাই। তিনি জানিয়ে দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কী। একটু সাধনা করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন, এই এই। তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে, কোনটা সৎ এবং কোনটা অসৎ। ঈশ্বর সত্য, এ সংসার অনিত্য।" পক্ষান্তরে একজন শিষ্যেরও এই গুণাবলীগুলি থাকা প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, একজন শিষ্যের মধ্যে পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞান পিপাসা ও অধ্যাবসায় প্রভৃতি এই গুণগুলি না থাকলে সে ধার্মিক হতে পারে না, শিষ্য হতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, ভক্ত সাধকের মনে অপরের জন্য হিংসা থাকা চলবে না, নিজ ধর্ম বা আদর্শকে অন্য ধর্ম বা আদর্শ থেকে ভিন্ন মনে করা উচিত নয়। অন্য ধর্ম বা আদর্শকে নিজ ধর্ম বা আদর্শ থেকে দুর্বল মনে করা উচিত নয়। সাধককে মনে রাখতে হবে, জাগতে যে বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্ম সম্প্রদায় দেখা যায়, সেগুলি সব একই ঈশ্বরের মহিমার বিভিন্ন প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। বিবেকানন্দ বলেন, শুধু ধর্ম নয়, ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারকগণ যারা আছেন, তাঁদের প্রতি ঘৃণা না করা, তাঁদের ছোট না ভাবা, শত্রু হলেও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এবং ধর্মের প্রকৃত আদর্শটিকে মানবসমক্ষে স্থাপন করতে হবে। একজন ভক্তযোগীর উচিত সকল ধর্মাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা করা, মান্য করা, সকলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা; কিন্তু প্রকৃত ধর্মের যে আদর্শ তোমার মধ্যে আছে বা সাধনের যে প্রণালী অনুসারে তুমি সাধন কর, তা অর্থাৎ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম একই, তাঁকে বিভিন্নভাবে জানার চেষ্টা করা হয় মাত্র। সেই একই ঈশ্বর বা ব্রহ্মের আদর্শের সাধন করতে হবে।

একজন সাধারণ সাধকের পক্ষে কীভাবে বা কোন উপায়ে ভক্তিযোগী হতে পারে সে বিষয়ে রামানুজ তাঁর বেদান্তভাষ্যে বলেছেন- "বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষা থেকে ভক্তি লাভ হয়।" একজন ভক্তি সাধকের জীবনে কিরূপ অনুশাসনের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে হয় এবং সাধনা করতে হয়। একজন ভক্তি সাধকে আচার-ব্যবহার সংযত করতে হবে, তাই নয়, সাধককে তার আহারাদি বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। সাধক যে আহার গ্রহণ করবেন, সেই গ্রহণের ফলে শরীর ও মন কোনোভাবে অশুদ্ধ না হয়, তার জন্য তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ভোজন দ্রব্য যাতে উত্তেজক না হয়, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী যে অসৎ, অশুভ ব্যক্তি না হন। আহার শুদ্ধ হলে সেই আহার গ্রহণের ফলে চিত্ত ও মন শুদ্ধি থাকে, ফলে সাধকের সাধনা কার্য সহজ ও সরল হয়। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না। এছাড়া একজন সাধককে তার ইন্দ্রিয় বাসনাগুলিতে নিয়ন্ত্রণ রাখতে সংযত

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.010.2026

থাকতে হয়। এছাড়া একজন সাধককে সমস্ত বিষয় থেকে আসক্তি বর্জন করতে হয়, স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। এই স্বার্থত্যাগ ও সংযম ছাড়া সাধক ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট হতে পারে না। প্রথম দিকে এই আত্মত্যাগ ও সংযমের মধ্যে দিয়ে ভক্তি সাধনা একটু কঠিন হলেও পরবর্তী কালে এই রকম ঈশ্বর চিন্তা সহজ হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তার শিষ্যদের উদ্দেশ্যে ভক্তি প্রসঙ্গে বলেন- "প্রথমে একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তারপর আর বেশি পরিশ্রম করতে হবে না।" যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান, আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধরতে হয়, সেইটুকু পার হয়ে গেলে আর না। যদি বাঁক পার হয় এবং অনুকূল হাওয়া বইলে, তখন মাঝি আরাম করে বসে হালে হাতটাকে রেখে দেয়- তারপর পাল টাঙাবার বন্দোবস্ত করে, তামাক সাজতে বসে। কামেনী-কাঞ্চনের ঝড়-তুফানগুলো কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি।"[১৪] এছাড়াও একজন সাধকের শুধু বাহ্যশুদ্ধি থাকলেই চলে না, তার অন্তশুদ্ধির প্রয়োজন হয়। সেই জন্য সাধককে অহিংস হতে হয়, দান, দয়া, করুণা, প্রেম ও ভালোবাসার সঞ্চার করতে হয়। লোভ-লালসা ত্যাগ করতে হয়। যে সাধকের মনে কোন জীবের প্রতি অনিষ্ট চিন্তা নেই, অর্থাৎ ভালো-মন্দ, শত্রু-মিত্র সকলের জন্য সব সময় শুভ চিন্তা থাকে, তার চিত্ত শুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রকৃত সাধক হতে পারেন। বিবেকানন্দ মনে করেন একজন সাধকের মনে যেন কোন দুর্বলতা না থাকে। তার জন্য সাধকের শরীরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখা প্রয়োজনীয়। শরীর দুর্বল থাকলে সে ব্যক্তি সঠিকভাবে সাধন কার্য করতে পারে না। আবার অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদ সাধনকার্যে বাধা সৃষ্টি করে। শরীর দুর্বল হলে মনে আনন্দ থাকে না, স্ফূর্তি থাকে না, তার ফলে সাধনা করতে বাধা আসে। তেমনি অতিরিক্ত আনন্দও যোগ সাধনার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই যখন মন শান্ত, সমাহিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, তখনই আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্ভব হয়। ভক্তিযোগের এই ধরনের সাধনাকে গৌণী ভক্তি বা সাধন ভক্তি বলা হয়। এই ভক্তি মার্গে অগ্রসর হওয়ার জন্য কিছু বাহ্যিক অবস্থার সাহায্য নেওয়া হয়। তাই এই অবস্থায় সাধক সগুণ সাকার ঈশ্বরের সাধনা করে। পরবর্তী কালে যখন এই ভক্তি পূর্ণ আকার বা চরম অবস্থা ধারণ করে, তখন আর কোনো কিছুর সাহায্য নিতে হয় না। এই ধরনের ভক্তিকেই পরাভক্তি বলা হয়। গৌণী ভক্তি আলোচনা কালে দেখলাম, এই পদ্ধতিতে সাধক আত্মশুদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার বাহ্যিক বিষয়ের অনুশীলন ও উপাসনা করতে হয়। কিন্তু পরাভক্তিতে এইরকম কোনো বাহ্যিক বিষয়ের অনুশীলন করতে হয় না। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, আত্মশুদ্ধি করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল ত্যাগ। তাঁর মতে, এই ত্যাগ ছাড়া কোনো জীব বা সাধকই পরাভক্তি লাভ করতে পারে না। এই ত্যাগই সমস্ত যোগের মূল ভিত্তি। ত্যাগ না করতে পারলে কোনো সাধকের পক্ষে তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। তাই বিবেকানন্দ বলেছেন—ত্যাগই প্রকৃত ধর্ম। যখন সাধক নিজে বুঝতে পারবে যে, এই জগত সংসারে ক্রমশ আবদ্ধ হয়ে পড়ছি; ক্রমশ জড়াত্মক হয়ে পড়ছি, তখন সে জাগতিক সমস্ত বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করতে থাকবে। আর এই ত্যাগ যখনই শুরু হবে, তখনই তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি শুরু হবে।[১৫] এই ত্যাগ করা সাধকের পক্ষে অতি সহজ ও সরল বিষয়। কেননা, এই ত্যাগ করার জন্য সাধকের কোনো কঠোর নিয়ম বা পরিস্থিতির সাহায্য নিতে হয় না, কোনো কিছু জোর করে ছাড়তে বা ধরতে হয় না; আপনা আপনি স্বাভাবিক অভ্যাসবশে এই ত্যাগ হয়ে যায়। তাই বিবেকানন্দ বলেছেন—ভক্তির জন্য যে বৈরাগ্য বা ত্যাগ, তা কোনো কিছু নষ্ট করে পেতে হয় না। যেমন অধিক উজ্জ্বল আলোকরশ্মি ক্রমশ কম উজ্জ্বল আলোকরশ্মির কাছে এলে, তা ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা থাকলে ক্রমশ জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি কমে যাবে; তাঁর জন্য কোনো প্রচেষ্টা বা কষ্ট করতে হয় না। এই ঈশ্বর প্রেম বা ভক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন ভাব ধারণ করবে, যখন সাধকের ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য, ঈশ্বরের সাধনার জন্য অন্য কোনো মাধ্যমের সাহায্য নিতে হয় না। কোনো প্রতীক, প্রতিমা, অবতার বা গুরুদেব ছাড়াই সে ঈশ্বরের ধারণা ও ধ্যান করতে পারেন এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন। সাধনের এই ভাবকেই বিবেকানন্দের ভাষায় পরাভক্তি বলা হয়।[১৬]

বিবেকানন্দ বলেন- ভক্তের মনে এই বৈরাগ্য ভাব ঐচ্ছিকভাবে বা জোরপূর্বক আসে না, ভক্তিযোগ সেই রকম উপদেশ দেয় না। ভালবাসতে বলে সেই উচ্চতম আদর্শকে, যার প্রতি প্রেম থাকলে সমস্ত রকমের নীচু স্বভাব, মানসিকতা সবই মন থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে। আমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবো, জগতে যা কিছু সুন্দর মহান, তা সবই প্রেম প্রসূত। আর যত খারাপ কিছু দেখতে পাই, তা সবই প্রেমের অভাব থেকে বা প্রেমের বিকার থেকে। এই প্রেমই সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুন্দরের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তা আসলে ঈশ্বরের কাছে টানে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভক্তি জন্মালে তখন আমাদের মনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা বাসনা স্থান থাকে না। তখন সবই প্রেমময় সেই ঈশ্বর বলে মনে হয়, সব কিছুর মধ্যে প্রিয়তম ঈশ্বরকে দর্শন হয়। আর কোন কিছুর প্রতি ভাল লাগা বা টান থাকে না, কোন ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না, ছোট-বড়, উচু-নীচু জ্ঞান থাকে না। সুখ-দুঃখের বোধ থাকে না, আঘাত ও ভালোবাসার মধ্যে প্রভেদ থাকে না। সবই ঈশ্বরের প্রকাশ বলে মনে হয়। সব কিছুই ঈশ্বরময় হয়ে যায়। জগতের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আপনা আপনি বৈরাগ্য ভাব চলে আসে। তখন সে তাঁর প্রেম বলে অতিন্দ্রীয় সত্যকে দেখতে পায়।

যখন ভক্তের মনে রাগ ও অনুরাগ জন্মায়, তখন ভক্তের মনে কোনো আসক্তি থাকে না, কোনো কামনা থাকে না। যার মনে ভগবান ছাড়া আর কিছু থাকে না, সে সাধক সব কিছু ত্যাগ করে। সব নাম, যশ, উপাধি ত্যাগ করে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ভগবানও তাই বলেছেন- "সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।"[১৭] এইভাবে যারা সব কিছু ত্যাগ করে, মনের সব বিষয় ভগবানকে নিবিষ্ট করে এবং নিরন্তর ভগবানের সেবা করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী হতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন- 'যারা তাঁদের মনকে আমায় সবিশেষ রূপে নিবিষ্ট করেন এবং তা প্রকৃত শ্রদ্ধাসহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তারাই সর্বশ্রেষ্ট যোগী।'[১৮] ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেন, যারা নিস্কাম, নির্বিকারভাবে ইন্দ্রিয় সংযত করে, সকলের মঙ্গল কামনায় উপাসনা করে, সেই সাধকই আমাকে লাভ করে। এটাই ভক্তিযোগের স্বাভাবিক ও সাধারণ ভাব।

সাধক সমস্ত আশয়-বিষয় চিন্তা ভগবানে সমর্পণ করবে, সকলের হিত কামনা করবে, ঈশ্বরের প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে সাধনা করবে। তাঁর মনে কোন সুখ-দুঃখ যেন না থাকে। দুঃখ থাকলেও সেই দুঃখ যেন বিষয় আশয় সম্পর্কিত না হয়। সেই দুঃখ যেন পরমপুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি না করার দুঃখ হয়, ভগবানকে না পাওয়ার দুঃখ হয়। তাহলে সেই যন্ত্রণা বা দুঃখ তাঁর মুক্তির কারণ হতে পারে। তারপর ভক্তি সাধক যখন সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, তখন তিনি ভগবানের পাদস্পর্শ করে ধন্য হন। তখন তাঁর জীবনের সমস্ত আশা পূর্ণ হয়ে যায়। আর কিছুই চাইবার থাকে না। ভক্তির এই স্তরের প্রকাশকে বিবেকানন্দ তদীয়তা বলেছেন। তিনি মনে করেন, ভক্তির তদিয়তা ভাব প্রকাশের জন্য সাধকের মধ্যে বিশ্বপ্রেমের আবির্ভাব ঘটাতে হয়। সাধক যখন বুঝতে পারে, ব্যষ্টি নয়, সমষ্টিকে ভালোবাসতে হবে। ব্যষ্টির নয়, সমষ্টির মধ্যে ঈশ্বর থাকে। এই সমষ্টি জগতের মধ্যেই ঈশ্বর প্রকাশ। এই সমষ্টি জগতই ঈশ্বর। তখন সাধক বুঝতে পারে, সমষ্টি প্রেম জন্মালে তার মধ্যে ব্যষ্টি প্রেম আপনা আপনি হয়ে যায়। যখন সাধকের মধ্যে সমষ্টি প্রেম উদয় ঘটবে, তখন সে দেখতে পাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যষ্টি সেই সমষ্টি ঈশ্বরেরই প্রকাশ। এই গভীর সমষ্টি প্রেমের উদয় ঘটলে সে অবস্থায় সাধক মনে করেন, জগতের কোন কিছুই আর আলাদা নয়। তখন তার কাছে সুখ-দুঃখ সমতুল্য বলে বোধ হয়।

দৈনন্দিন জীবনে ভক্তিযোগ

বিবেকানন্দের 'ভক্তিযোগ' বা ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথ—একটি গভীর আধ্যাত্মিক পন্থা, যেখানে তিনি ভক্তিকে কেবল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে নয়, বরং এক জীবনদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। দৈনন্দিন জীবনে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষকে মানসিক শান্তি, ভালোবাসা, সহানুভূতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে

পরিচালিত করে। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ ভক্তি কথার অর্থ শুধু ঈশ্বর প্রেম বা ঈশ্বরসান্নিধ্যা লাভের কৌশলকেই বোঝাতে চাননি, বরং ভক্তি কথার অর্থ হল এক বিশেষ উপায় বা পথ বা আদর্শ বা নীতি বা জীবনযাপন প্রণালীকে বুঝিয়েছেন, যেখানে আত্মসংযম থাকবে, একাগ্রতা থাকবে, একনিষ্ঠতা থাকবে, শ্রদ্ধা থাকবে এবং কর্মের প্রতি প্রেম থাকবে। কারণ ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য বা সৎলক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এবং যে কোনো কর্মের সফলতার জন্য প্রয়োজন সঠিক উপায় বা পথ, সঠিক আদর্শ, সঠিক নীতি, সঠিক জীবনযাপন প্রণালী, একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার। এই ভক্তি আমাদের অহংকার, লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি ত্যাগ করতে শেখায় এবং মনঃশান্তি ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। মানুষ যখন কোনো কাজ নিস্বার্থভাবে পরিণামের কথা না ভেবে শুধুমাত্র লক্ষ্যস্থির রেখে বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে, তখন সেই কাজ নিঃস্বার্থ সেবার রূপ নেয়। কর্মের প্রতি নিস্বার্থ প্রেমকেই ভক্তি বলা হয়। যে প্রেমে স্বার্থ জড়িত, তা ভক্তি হতে পারে না। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "যে প্রেম স্বার্থহীন, সেই প্রেমেই সত্যিকারের ভক্তি।" মানুষ যখন প্রেম ও ভক্তির শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে, তখন পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে সহানুভূতি ও মমতা প্রদর্শিত হবে, যা সমাজে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। এই ভক্তিভাব কিভাবে আসবে বা ভক্তির মানে কী? এই ভক্তি কি কেবল যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা বা উপাসনার দ্বারা সম্ভব? নাকি ভক্তি মানে ভালোবাসা, সমার্পণ করা, ত্যাগ করা? স্বামী বিবেকানন্দ ভক্তি বলতে শুধুমাত্র কিছু আসন ও নিয়ম অনুশীলনকেই ভক্তি বলেননি। তিনি ভক্তি বলতে যে কোনো কাজের প্রতি ভালোবাসাকে বুঝিয়েছেন, যেকোন কাজকে ভালোবেসে ঈশ্বরকে সমার্পণ করাকেই ভক্তি বলেছেন। তাই তিনি বলেছেন, "যে কাজকে ঈশ্বরার্পণ করা যায়, সেই কাজই ভক্তির কাজ।" অর্থাৎ যে কোনো কাজ, সে কাজ অফিসে কাজ করা, পরিবারের যত্ন নেওয়া, সমাজের সেবা করা, বিজ্ঞান আবিষ্কার করা যাই হোক না কেন, সবই ভক্তি হতে পারে যদি তা নিঃস্বার্থভাবে করা যায়। এইভাবে কর্ম করলেই সেই কর্ম একসময় ধ্যান, উপাসনা বা সাধনা হয়ে ওঠে। ভক্তির দ্বারা চালিত হলে, অর্থাৎ ভক্তির পথে চললে মানুষ কামনা-বাসনার দাসত্ব ছেড়ে আত্মসংযমী হতে পারে, আপাত বাহ্যিক সুখ ও বিলাসিতা ছেড়ে আত্মিক সুখের অনুসন্ধানে ব্রতী হতে পারে। ফলস্বরূপ, আত্মসংযমী ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন হয় সাদাসিধে, কিন্তু শান্তিপূর্ণ। ভক্তিভাব সমাজে ভাতৃত্ব ও ঐক্যবোধ করতে সাহায্য করতে পারে। অন্ততপক্ষে, স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেন যে "সব ধর্মই এক মহান সত্যের দিকে নিয়ে যায়।" ভক্তিযোগের এই ভক্তিভাব সকল মানুষের প্রতি এবং সকল ধর্মের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে শেখায়, যা সমাজের সহাবস্থান ও মানবিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে। তাই বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের ভক্তিযোগ কেবল ধর্মীয় অনুশাসন নয়, বরং জীবনের দর্শন। দৈনন্দিন জীবনে এর অনুশীলন মানুষকে করে তুলবে শান্ত, সৎ, সহানুভূতিশীল এবং আত্মনির্ভরশীল।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১। 'ভক্তিযোগে এক বিশেষ সুবিধা- উহা আমাদের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরে পৌছাবার সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক প্রস্থা'।- স্বামী বিবেকানন্দের, *বাণী ও রচনা*, চতর্থ খণ্ড, প্রকাশক- স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০০০৩, প্রথম সংস্করণ- ২১/০৩/১৯৬৪, চতুর্থ সংস্করণ- ১৩৮২, ২৬তম পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫।

২। পূর্ণ জ্ঞানের সহিত প্রকৃত ভক্তিও অভিন্ন। স্বামী বিবেকানন্দের, *বাণী ও রচনা*, চতর্থ খণ্ড, প্রকাশক- স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০০০৩, প্রথম সংস্করণ- ২১/০৩/১৯৬৪, চতুর্থ সংস্করণ- ১৩৮২, ২৬তম পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬।

৩। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ।– মন্ডুকোপনিষৎ ২/২/৫।

৪। অদ্বেষ্টা সর্বভূতানং মৈত্রঃ করুণা এব চ। ...অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।– দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩-১৯তম শ্লোক, *শ্রীমদ্ভবদ্গীতা যথাযথ,* সুলভ সংস্করণ, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল, অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, অনুবাদক – শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী, প্রকাশক- ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী, প্রথম সংস্করণ ২০০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৭, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ত্রয়োদশ সংস্করণ ২০১৫, গ্রন্থ-স্বত্ব ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস, বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর ৭৪১৩১৩, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৬-৪৩০।

৫। যাঁহারা এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যেখানে সৃষ্টি সৃষ্ট বা স্রষ্টা নাই, যেখানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় বা জ্ঞান নাই, যেখানে আমি তুমি বা তিনি নাই, যেখানে প্রমাতা প্রমেয় বা প্রমাণ নাই, সেখানে কে কাহাকে দেখে? এরূপ ব্যক্তি সব কিছুর বাহিরে গিয়াছেন, জাহাকে বাক্য অথবা মনও যাইতে পারে নয়া।' এরূপ ব্যক্তি এমন স্থানে গিয়েছেন।' জাহাকে শ্রুতি ' নেতি, নেতি, বলিয়া বর্ননা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা এরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারেন না বা এরূপ অবস্থায় যাইতে ইচ্ছা করেন না তাঁহারা সেই এক অবিভক্ত ব্রহ্মকে প্রকৃতি, আত্মা এবং ঐ উভয়ের অন্তর্যামী ঈশ্বর এই তিন রূপে বিভক্ত দেখিবেন।"- স্বামী বিবেকানন্দের, *বাণী ও রচনা,* চতর্থ খণ্ড, প্রকাশক- স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০০০৩, প্রথম সংস্করণ-২১/০৩/১৯৬৪, চতুর্থ সংস্করণ- ১৩৮২, ২৬তম পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩।

৬। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতম্। ধর্মাসংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে।। চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টম শ্লোক, *শ্রীমদ্ভবদ্গীতা যথাযথ,* সুলভ সংস্করণ, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল, অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, অনুবাদক – শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী, প্রকাশক- ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী, প্রথম সংস্করণ ২০০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৭, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ত্রয়োদশ সংস্করণ ২০১৫, গ্রন্থ-স্বত্ব ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস, বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর ৭৪১৩১৩, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬৪।

৭। আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পক্ষে গ্রন্থরাশি পর্যাপ্ত নয়। জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে অপর এক আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক। স্বামী বিবেকানন্দের, *বাণী ও রচনা,* চতর্থ খণ্ড, প্রকাশক- স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০০০৩, প্রথম সংস্করণ-২১/০৩/১৯৬৪, চতুর্থ সংস্করণ- ১৩৮২, ২৬তম পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭।

৮। তদ্বিজ্ঞানার্থন স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। ১/২/১২- মন্ডুকোপনিষৎ।

৯। নিজের মধ্যেই যদি শক্তি না থাকে, তিনি সঞ্চার করিবেন কী?।- স্বামী বিবেকানন্দের, *বাণী ও রচনা,* চতর্থ খণ্ড, প্রকাশক- স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০০০৩, প্রথম সংস্করণ- ২১/০৩/১৯৬৪, চতুর্থ সংস্করণ- ১৩৮২, ২৬তম পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২১।

১০। ন নরেনাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।– ১/২/৮ কঠোপনিষৎ।

১১। "গুরুর কৃপা হলে আর ভয় নাই। তিনি জানিয়ে দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কী। একটু সাধনা করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন, এই এই। তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে, কোনটা সৎ কোনটা অসৎ। ঈশ্বর সত্য, এ সংসার অনিত্য।"- *অখণ্ড শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত,* শ্রীমা- কথিত, প্রথম খন্ড, প্রকাশক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩। প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬-১৯৮৭, ৪১তম পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪২১, মুদ্রক রমা আর্ট প্রেস, ৬/৩০ দমদম রোড কলকাতা-৭০০০৩০। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২০০।

১২। যে ভক্ত হইতে চায়, তাহার জানা উচিৎ, 'যত মত তত পথ'- তাহার জানা উচিৎ, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় একই ভগবানের মহিমার বিভিন্ন বিকাশ মাত্র।- স্বামী বিবেকানন্দের, *বাণী ও রচনা,* চতর্থ খণ্ড, প্রকাশক- স্বামী

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.010.2026

বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০০০৩, প্রথম সংস্করণ- ২১/০৩/১৯৬৪, চতুর্থ সংস্করণ- ১৩৮২, ২৬তম পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩০।

১৩। " বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুভবর্ষা থেকে ভক্তি লাভ করে"। স্বামী বিবেকানন্দের, *বাণী ও রচনা,* চতর্থ খণ্ড, প্রকাশক- স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০০০৩, প্রথম সংস্করণ- ২১/০৩/১৯৬৪, চতুর্থ সংস্করণ- ১৩৮২, ২৬তম পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২।

১৪। প্রথমে একটু উঠে পরে লাগতে হয়।তারপর আর বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান, আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয় হাল ধরতে হয়, সেইটুকু পার হয়ে গেলে আর না। যদি বাঁক পার হোল আর অনুকূল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম করে বসে হালে হাতটাঠেকিয়ে রাখে- তারপর পাল টাঙাবার বন্দোবস্ত করে, তামাক সাজতে বসে। কামেনী-কাঞ্চনের ঝড় তুফান গুলো কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি"। *অখণ্ড শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত,* শ্রীমা- কথিত, প্রথম খন্ড, প্রকাশক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬১।

১৫। 'ত্যাগই প্রকৃত ধর্ম, যখন যখন মানবাত্মা সংসারের সমুদায় বস্তু দূরে ফেলিয়া গভীর তত্তসমূহ অনুসন্ধান করে, যখন চৈতন্যস্বরূপ মানব বুঝিতে পারে, দেহরূপ জড়ে বদ্ধ হইয়া জড় হইয়া যাইতেছি এবং ক্রমশঃ বিণাশের পথে অগ্রসর হইতেছি, তখনই সে জড় পদার্থ হইতে নিজের দৃষ্টি সরাইয়া লয়- তখনই ত্যাগ আরম্ভ হয়, তখনই প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি আরম্ভ হয়।'- স্বামী বিবেকানন্দের, *বাণী ও রচনা,* চতর্থ খণ্ড, প্রকাশক- স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০০০৩, প্রথম সংস্করণ- ২১/০৩/১৯৬৪, চতুর্থ সংস্করণ- ১৩৮২, ২৬তম পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৯।

১৬। 'ঈশ্বরপ্রেম ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া এমন একভাব ধারণ করে, যাহাকে পরাভক্তি বলে।'- স্বামী বিবেকানন্দের, *বাণী ও রচনা,* চতর্থ খণ্ড, প্রকাশক- স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০০০৩, প্রথম সংস্করণ- ২১/০৩/১৯৬৪, চতুর্থ সংস্করণ- ১৩৮২, ২৬তম পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪০।

১৭।"সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরনং ব্রজ"।– অষ্টাদশ অধ্যায়, ৬৬তম শ্লোক, *শ্রীমদ্ভবদ্গীতা যথাযথ,* সুলভ সংস্করণ, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল, অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, অনুবাদক – শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী, প্রকাশক- ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী, প্রথম সংস্করণ ২০০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৭, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ত্রয়োদশ সংস্করণ ২০১৫, গ্রন্থ-স্বত্ব ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস, বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর ৭৪১৩১৩, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৬৬।

১৮। "ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধায় পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।"- দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূত্র, *শ্রীমদ্ভবদ্গীতা যথাযথ,* সুলভ সংস্করণ, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল, অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, অনুবাদক – শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী, প্রকাশক- ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী, প্রথম সংস্করণ ২০০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৭, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ত্রয়োদশ সংস্করণ ২০১৫, গ্রন্থ-স্বত্ব ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস, বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর ৭৪১৩১৩, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪১৬।